লোক প্রশাসন সাময়িকী
৯ম সংখ্যা, জুন ৯৭, আষাঢ় ১৪০৪

লোক-প্রশাসনে দক্ষতা ঃ একটি পর্যবেক্ষণমূলক আলোচনা

এ, কে, এম, মতিউর রহমান *
মোঃ জাহিদুর রহমান

ভূমিকা

"এমনকি কয়েক দশক আগেও রাষ্ট্রীয় সেবা পাওয়া যেতো কোন প্রকার ঘুষ না দিয়ে বা প্রভাব না খাটিয়ে। কিন্তু এখন কেন এটা সম্ভব নয়? কি জন্য এটা হচ্ছে? কোন ব্যবস্থা এটাকে রক্ষা করছে, আইন, বিচার না প্রশাসনিক ব্যবস্থা? জনগণের অর্থে পরিচালিত এই প্রশাসন কার স্বার্থে চলছে?" এ কথাগুলো বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ২৪শে জুন, ১৯৯৬ তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে।

"জনকেন্দ্রিক, জবাবদিহি, স্বচ্ছ এবং কার্যকর সিভিল প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার এবং কাঠামোর প্রতিটি পর্যায়ে সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। প্রশাসনকে হতে হবে জবাবদিহিমূলক দায়িত্বশীল এবং দক্ষ।" এডাব এর পক্ষ থেকে এ কথাগুলো বলা হয়েছে (গ্রাসরুট)।

জাতিসংঘের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশ সরকারের কার্যকারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন মহল বেশ উদ্বিগ্ন। এমন একটি উপলব্ধি এসেছে যে জবাবদিহির উপায় এবং প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়, ঠিক তেমনিভাবে কার্যকর, নিরপেক্ষ ও দক্ষ নীতি এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে পারছেনা।"

দেশের প্রধানমন্ত্রী, বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার এরূপ মন্তব্য থেকে একটি কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো প্রশাসনে দক্ষতার অভাব সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডকে ব্যাহত করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রশাসনে কেন এই অদক্ষতা? কিভাবে একে দক্ষ ও গতিশীল করা যায়? যা হোক, উপমহাদেশের সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভের জন্য এর কিছুটা ইতিহাস পর্যালোচনা করা দরকার।

উপমহাদেশে সিভিল সার্ভিস

ভারতবর্ষ উপমহাদেশে সিভিল সার্ভিসের বিশেষত নির্বাহী কর্মকর্তাদের যে পেশাগত মূল্যবোধের প্রকাশ দেখা যায়; তা "ক্লাসিক্যল জেনারেলিজম" বা "ধ্রুপদী

---

* অষ্টাদশ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের প্রশিক্ষণার্থীদ্বয়, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাধারণবাদ" অথবা "অভিভাবকত্ব মূলক" যা তত্ত্বগতভাবে কনফুসিয়স ও প্লেটোর দর্শনের আওতায় পড়ে। ম্যাক্সওয়েবার চৈনিক মান্ডরিনেট বা নির্বাহী কর্মকর্তা শ্রেণীকে বিদগ্ধজন হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। কেউ কেউ সেজন্য ভারতবর্ষ উপমহাদেশের সিভিল সার্ভিস সমূহে যে "ধ্রুপদী সাধারণবাদ" লক্ষ্য করা যায় তার উৎস খুঁজেছেন চৈনিক সিষ্টেমে। এ সিষ্টেমে গুরুত্ব দেয়া থাকে পরীক্ষিত মেধাসম্পন্ন মানবিক শাস্ত্রসমূহে বুৎপত্তি রয়েছে এমন সব তরুণদের, যারা রাষ্ট্রের সেবায় জীবন নিবেদন করবেন।

এ ঐতিহ্য উপমহাদেশের সিভিল সার্ভিসের বিকাশের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাঝে নিহিত রয়েছে। এ দেশের আধুনিক সিভিল সার্ভিসের বিকাশের ধারাটি যার যাত্রা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়িক পর্যায় থেকে শুরু। ব্যবসামূলক পর্যায়ের শুরুতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সিভিল সার্ভিসকে বলা হতো "মাননীয় কোম্পানীর সিভিল সার্ভিস"। এ সার্ভিসের অধীন কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকৃতপক্ষে ছিল বাণিজ্যিক এজেন্ট। ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল থেকেই কোম্পানীর সিভিল সার্ভিস শুধুমাত্র বাণিজ্য ক্ষেত্রে কর্মকান্ড পরিচালনা করা ছাড়াও বৃহত্তর চৌহদ্দিতে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। ইংল্যান্ডের সরকারী কর্মকান্ড পরিচালনা করার নীতির ভিত্তিতে হেস্টিংসের আমলে আধুনিক সিভিল সার্ভিসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এ কাঠামোকেই পরবর্তীতে কর্ণ ওয়ালিস সম্প্রসারিত করে প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে উপস্থিত করেছিলেন। এ সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার সাধারণ শাখার আওতায় যেসব কর্মকান্ড পড়ে বলে ভাবা হতো তা হচ্ছে, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত ও আইন-শৃংখলা, রক্ষা। ধীরে ধীরে উদীয়মান একটি পুলিসী রাষ্ট্রের জন্য এসব কর্মকান্ড ছিল সার্বিক কর্মকান্ডের একটি প্রাথমিক কাঠামোর মতো। ১৮৫৭ সালের সেপাহী বিদ্রোহের ফল হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায় খোদ ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্রের উপর। ফলে ভারতবর্ষ উপমহাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর আত্মিক ও কলেবর উভয় দিকের পরিবর্তন ঘটে।

বৃটিশ ভারতে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের আচার-আচরণে একটা প্রভুত্বমূলক ভাব ছিল। এ দেশীয় প্রশাসক শ্রেণী সাধারণভাবে তাই সরকারী ও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনেও বাহ্যিক আড়ম্বর ও দাপট প্রদর্শনমূলক মনোভাব ব্যক্ত করতে সংকোচ করতেন না। শাসক যন্ত্র ও শ্রেণীর অংশ হিসেবে ইউরোপীয় প্রভুদের মত এ দেশীয় সরকারী কর্মকর্তাগণও তাই কর্তৃত্ব প্রয়াসী হবার প্রবণতা দেখিয়েছেন, যদিও পরাভূত দেশেরই মানুষ ছিলেন। অন্য দিকে ইংরেজ কর্মীদের তুষ্টি সাধনেও তাদের কম ব্যাপৃত থাকতে হত না। দ্বিমুখী ও টানপোড়নে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ম্যাকলের কথায় "গায়ের রং ও রক্তে তারা এ দেশীয় কিন্তু মনোভাব, রুচি ও বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে তারা ইংরেজ হয়ে পড়েছিলেন।"

উপমহাদেশে বিভাগোত্তর কালে নতুন সংগঠিত রাষ্ট্রগুলোর সমাজপ্রেক্ষিতে একটি ক্রান্তিলগ্ন উপস্থিত হয়েছিল, যা সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিকের সূচনা কাল। নতুন জাতীয়তাবাদের উদ্ভুত উচ্চাভিলাষে স্বাধীন সরকার তখন পশ্চাৎপদ দেশে দ্রুত আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করলো। এত বিশাল কর্মকান্ড এত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে গেলে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সনাতনী

দক্ষতা অপরিবর্তিত রেখে করা সম্ভব নয়। তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। বস্তুত এ থেকেই শুরু হয় সনাতনী মনোভাব জেনারেলিষ্ট সিভিল সাভেন্টের স্থলে 'পেশাদারী' সিভিল সার্ভিস বিকাশের সূচনা। এ সকল আইসিএস এবং পরবর্তীতে দেশবিভাগের পর সিএসপি, ইপিসিএস গঠনের ইতিহাস প্রায় সকলেরই জানা।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থা

বাংলাদেশে বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোতে সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে সচিবালয়। সচিবালয়ে রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এটাই হচ্ছে সরকারের সকল নীতি ও কার্যের উৎসস্থল। মন্ত্রণালয়ের প্রধান হচ্ছেন মন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস অনুসারে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যের ভাগ করা আছে। প্রশাসনিক কাজের জন্য সচিব দায়ী থাকেন। তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাব কর্মকর্তা। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের এক বা একাধিক বিভাগ রয়েছে। বিভাগের দায়িত্বে থাকেন একজন সচিব বা অতিরিক্ত সচিব। মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীনে রয়েছে উইং, ব্রাঞ্চ এবং সেকশান। উইং এর দায়িত্বে থাকেন একজন যুগ্মসচিব, ব্রাঞ্চের দায়িত্বে থাকেন একজন উপসচিব এবং সেকশানের দায়িত্বে থাকেন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব।

একটি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অফিস বা সংযুক্ত বিভাগের মাধ্যমে সরকারের নীতি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। অধীনস্থ অফিসগুলো সংযুক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে থাকে। জনসেবা এবং বিশেষ কোন উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য স্বায়ত্বশাসিত বা আধা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা রয়েছে। এছাড়া পাবলিক কর্পোরেশনগুলো বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে যে নতুন রুলস অব বিজনেস কার্যকর হতে যাচ্ছে, তাতে মন্ত্রী তার মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল কর্মকর্তার কাজের জন্য জবাবদিহি হবেন।

সরকারের এই দায়িত্ব পরিচালনার জন্য দেশব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন ক্যাডারে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এবং নিজ নিজ একাডেমীতে ক্যাডার ভিত্তিক বিভাগীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমস্যাবলী

১। সরকারের কার্য নির্বাহী বিভাগের উপর সংসদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গড়ে উঠেনি। যার ফলে পাবলিক সার্ভিসের জবাবদিহি ব্যাহত হচ্ছে।

২। বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অতিমাত্রায় কেন্দ্রমুখী। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মতামতের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। উচ্চ পর্যায়ের মতামতই সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। এ পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল ও প্রলম্বিত। তাছাড়া অধীনস্থ কর্মকর্তার প্রতি উপরস্থ কর্মকর্তার অবিশ্বাস তো রয়েছেই। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হচ্ছে।

৩। বর্তমান আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে এবং এমনকি সংস্থার মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটি অবিশ্বাসবোধ কাজ করছে। এই অবিশ্বাসের

ফলে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে। যার ফলে জবাবদিহি গুলিয়ে যাচ্ছে এবং check and balance over lapping হচ্ছে। সর্বোপরি জবাবদিহি ও নিয়ন্ত্রণ উভয়ই বিপর্যস্ত হচ্ছে।

৪। ক্রমবর্ধমান আমলাতন্ত্রকে পরিচালনা করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে সরকারকে অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দিতে হয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের লাইন এজেন্সীতে। এর ফলে আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটছে।

৫। কর্মকর্তা নিয়োগের মানদন্ডে উল্লেখযোগ্য অবনতি হয়েছে। এটি দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অবক্ষয়ের ফল। আর একটি জটিলতর দিক হচ্ছে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত কোটা পদ্ধতি।

৬। পাবলিক সেক্টরে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে যোগ্য প্রশিক্ষক নেই। তাছাড়া সিভিল কর্মকর্তাদের দেশে প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ নেই। এই প্রতিষ্ঠানগুলো যে ধরনের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তা কর্মক্ষেত্রের কাজের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত নয়।

৭। প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ঘন ঘন বদলীর ফলে পাবলিক সেক্টর ব্যবস্থাপনার মান ও দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাঝে মাঝে এক বছর বা কম সময়ের মধ্যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাধিক বার বদলী হয়। তিন বছর পর পর বদলীর যে সাধারণ নিয়ম রয়েছে তা পালন করা হচ্ছে না। ফলে দেখা যায় কোন একজন কর্মকর্তা একটি বিষয়ে পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করার পূর্বেই তাকে চলে যেতে হচ্ছে। বিশেষ করে Technical Department গুলোতে এর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে।

৮। সিভিল সার্ভিসে মেধার ভিত্তিতে পদোন্নতির বিধান থাকলেও তা যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে না। পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতাই মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এই ব্যবস্থা কর্মকর্তাদের মোটিভেশন এবং দক্ষতাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে।

১৯৮৯ সালে তৎকালীন সরকার সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক ও USAID এর সহায়তায় "Public Administration Efficiency Study" নামে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন। এর রিপোর্ট প্রশাসনের দক্ষতার পথে যে বাধাগুলোর কথা বলা হয়েছে তা হলো ঃ

১। লঘু জবাবদিহি (Diluted accountablility)

২। অতিকেন্দ্রিকতা (Overcentralisation)

৩। জটিল কার্যপদ্ধতি (Complex operating procedures)

৪। দূর্বল সহায়ক পদ্ধতি (Weak support systems)

৫। অপর্যাপ্ত মানব সম্পদ (Inadequate human resources)

প্রশাসনিক দক্ষতার পথে এ বাধাগুলো দূরে করে প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ রাখা যেতে পারে ঃ

সংগঠন ও কাঠামো

১। প্রাথমিকভাবে বাছাই করা মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দফতর, শাখা সেল ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা নিয়ে পরিকল্পিত সাংগঠনিক সমীক্ষা শুরু করতে হবে। পরবর্তীতে গোটা সরকারের ক্ষেত্রে এটি সম্প্রসারিত হবে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকার কাঠামো গঠনের সংজ্ঞা পাওয়া যাবে।

২। স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনকে ক্রমান্বয়ে জোরদার করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা করে যুক্তিসংগতভাবে দায়িত্ব বন্টন পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩। কার্যাবলী পরীক্ষার পর এবং নিবিড়, সন্নিবিষ্ট ও সুসংগত করার নীতিমালার ভিত্তিতে সরকার কাঠামো যুক্তিসংগত করতে হবে। সমন্বয় সাধান জোরদার এবং সরকার আয়ত্বে রাখার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যা হ্রাসের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র বিবেচনায় আনতে হবে।

৪। কাজ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বরাদ্দ সম্পর্কিত সরকারী আইন ও বিধি বিধান পরিকল্পিতভাবে পর্যালোচনা ও সুষ্ঠুভিত্তিক করতে হবে, যাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য ও মাত্রাতিরিক্ত দায়িত্ব বিলোপ করা যায়। এরপর সকল সংশ্লিষ্ট সরকারী ম্যানুয়াল সময়োপযোগী করতে হবে।

৫। সংবিধানের ২২ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা সহ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

৬। সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ নম্বর ধারা এবং স্থানীয় সরকার পর্যালোচনা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয়ভাবে নিয়োজিত অফিসারদেরকে ক্রমান্বয়ে নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীনে আনতে হবে।

৭। অডিট পদ্ধতি শক্তিশালী করতে হবে। সেই সাথে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। অডিট ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়াতে হবে।

সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থাপনা ঃ

১। কর্মকর্তা নির্বাচন ও পদোন্নতি হবে মেধার ভিত্তিতে। এই মেধা নিরূপণ করতে হবে একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং তা সংজ্ঞায়িত হবে এভাবে : (১) নির্বাচনের জন্য প্রদর্শিত যোগ্যতা, বিশেষজ্ঞান ও শিক্ষাগত মান (২) পদোন্নতির জন্য কাজ, পরীক্ষা ও সাফল্যের সঙ্গে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ সম্পাদন।

২। পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে। এটি করতে হবে সদস্যদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি ও চাকরির শর্তাবলী উন্নত করার মাধ্যমে। সচিবালয়, লজিষ্টিক ও টেকনিক্যাল জ্ঞানের মানও উন্নত করা প্রয়োজন। কমিশন যাতে সংবিধানের ১৩৭-১৪১ ধারায় বর্ণিত দায়িত্বসমূহ কার্যকর ও স্বাধীনভাবে সম্পাদন করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আওতায় সর্বস্তরের সিভিল সার্ভেন্টদের জন্য পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৪। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রচলিত ধাপগুলো কমাতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সংস্থার মধ্যে horizontal communication কে উৎসাহিত করতে হবে।

৫। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তার কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য এ সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের পূর্বেই Working Paper তৈরী করা প্রয়োজন, যথাযথ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং সিদ্ধান্তগুলো লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

৬। বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিকট অধিক ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে Procurement এবং contracting পদ্ধতি সহজতর করতে হবে।

৭। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রচলিত আচরণ বিধি সংশোধন করে সেগুলো একটি যথোপযোগী আচরণ বিধিতে সমন্বিত করতে হবে।

৮। ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যকার পার্থক্য দূর করতে হবে। একই ধরনের ক্যাডারগুলোকে কমসংখ্যক ক্যাডারে একীভূত করে এবং বেতন ব্যবস্থা ও চাকরির শর্তাবলী সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আন্ত-ক্যাডার পার্থক্য দূর করতে হবে। এর ফলে মেধা ভিত্তিক এবং শীর্ষ পর্যায়ে পদোন্নতির আরো সুযোগ খুলে যাবে।

৯। যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পর্যায়ের অফিসারদের সরাসরি পরিচালনার দায়িত্ব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে দিতে হবে। অন্য সকল পর্যায়ের অফিসারদের পরিচালনা করবে তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও একাউন্টিং সংস্থাসমূহ।

১০। মন্ত্রণালয়সমূহের বিশেষ ক্যাডারের জন্য পদ সংরক্ষিত রাখার প্রথা বিলোপ করতে হবে এবং সচিবালয়ের পদসমূহের জন্য যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সকল ক্যাডার থেকে মুক্ত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১। বর্তমানে ঘন ঘন বদলীর ফলে সরকার পরিচালনায় দক্ষতার ওপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি করে, তা হ্রাসের লক্ষ্যে একটি উপযুক্ত বদলী নীতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসকে পেশাভিত্তিক করে তুলতে হবে।

১২। কর্মকর্তা/কর্মচারী যাতে পদের সংগে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে সেজন্য প্রথম শ্রেণীর অফিসার পদ থেকে শুরু করে সরকারের সকল পদের জন্য পদ-মর্যাদার বিবরণ তৈরী করতে হবে।

১৩। সংবিধানের ৩৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োগ ও চাকরির শর্ত বিধিবদ্ধ করার জন্য যথাযথ সিভিল সার্ভিস আইন ও বিধি প্রণয়ন করতে হবে।

১৪। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপযোগী সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের স্বচ্ছ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে পদশ্রেণী বিন্যাস এবং গ্রেডের ভিত্তিতে ক্যাডার ও ক্লাসসিস্টেমের স্থলে পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম করতে হবে।

১৫। অফিসের সাজ সরঞ্জাম, ফাইল এবং Paper Work পদ্ধতির আধুনিকীকরণ করতে হবে।

১৬। কম্পিউটার ভিত্তিক Management এবং Information system গড়ে তুলতে হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ঃ

১। জনকেন্দ্রীক উন্নয়ন এবং জনসেবার জন্য নৈতিকতা প্রশিক্ষণ সিডিউলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২। কম্পিউটার সজ্জিত করণ, প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম এবং অত্যাধুনিক উপকরণ সংগ্রহ ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটসমূহকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

৩। কাজের মূল্যায়ন ও পদোন্নতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত পরীক্ষাসমূহ সময়ে সময়ে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসকে পেশাদারমূলক করে তুলতে হবে।

৪। সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যে টেকনিক্যাল ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিয়মিত ও পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষণ চাহিদার মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

৫। স্বতন্ত্র অফিসারদের জন্য পেশাগত উন্নতির সুযোগ দিতে হবে। বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন এবং পেশা উন্নয়ন চাহিদার প্রেক্ষিতে এটি স্থির করতে হবে।

৬। সর্বস্তরের সরকারী ইউনিটসমূহে যৌথ টিমের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭। স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন সম্প্রসারণ ও জোরদার করতে হবে।

৮। সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের চাহিদামাফিক সমস্যার সমাধান ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতার মানদন্ড কি হবে তা পূর্বে নির্ধারণ করতে হবে এবং মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

নীতি নির্ধারণ ঃ

১। সকল সরকারী তথ্যের জন্য পরিকল্পিত data base গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে নজর দিতে হবে অর্থ, লোক ও কার্য সম্পাদন সম্পর্কিত data এর ওপর।

২। মন্ত্রণালয়সমূহের স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিশেষজ্ঞ পদ ও ইউনিট সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারের নীতি বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

৩। নীতি প্রণয়ন সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রুপ ও বিশেষজ্ঞ গ্রুপের প্রতিনিধিদের উপদেষ্টা পরিষদ ও কমিটি গঠন এবং ব্যবহার করতে হবে।

৪। সিদ্ধান্ত প্রণয়ন সংক্রান্ত বর্তমান আইন ও প্রথা পর্যালোচনা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত প্রণেতা কর্তৃপক্ষ যাতে যথাযথ পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব এবং দায়িত্ব পালন করতে পারে, তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে।

৫। সংসদ, রাজনৈতিক নির্বাহী ও স্থায়ী নির্বাহীরা যাতে তথ্য পেতে পারেন সে জন্য data base নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে।

৬। মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে ও অপারেটিং ইউনিটসমূহে যথাযথ পর্যায়ে টিমের দ্বারা যৌথ সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৭। সরকারী নীতিমালা প্রণয়ন ও উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে গবেষণা ও রিপোর্ট প্রণয়নে সক্ষম স্বায়ত্বশাসিত পলিসি 'থিংক ট্যাংক' গড়ে উঠাকে উৎসাহিত করতে হবে।

এ সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

১। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা প্রয়োজন। এই দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হবে একটি গতিশীল প্রশাসন তৈরী করা।

২। এটা বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

৩। দক্ষতাবৃদ্ধিকরণে বর্তমান সরকারী ব্যবস্থাকে কাজে লাগতে হবে।

৪। বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিকট ব্যাপক ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

৫। জবাবদিহি পদ্ধতিকে শক্তিশালী করতে হবে।

অধুনা আমাদের দেশে সকল বিষয়ের জন্য দায়ী করা হয় প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। কি রাজনীতিবিদ, কি অন্যান্য সরকারী কর্মচারী সবারই যেন এক কথা, সমস্ত অনর্থ, ব্যর্থতা-হতাশা-দারিদ্র-অনুৎপাদনশীলতা-গণতন্ত্রহীনতা সব কিছুর জন্য দায়ী আমলাতন্ত্র এবং প্রশাসন ক্যাডারের কর্তা ব্যক্তিরা। সমস্ত পাপের বোঝা স্কেপগোটের মত প্রশাসন ক্যাডারের ঘাড়ে চাপিয়ে সবাই যেন নিষ্পাপ, নিস্কলঙ্ক, পূত-পবিত্র। বৃটিশ আমলে আমলাতন্ত্র বলতে শুধু-প্রশাসন ক্যাডারকেই বুঝাতো, কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় এ ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। একটি জিনিস মনে রাখতে হবে, সমগ্র প্রশাসন বলতে একটি ক্যাডারকে বুঝালে অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পাবে। Macro দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে হবে। প্রশাসন ক্যাডার এবং আমলাতন্ত্র সমার্থবোধক, অন্য কোথাও আমলার অস্তিত্ব নেই; এ ধারণা নিতান্ত অজ্ঞতারই ফলশ্রুতি।

মূলত প্রত্যেক সংগঠনই আমলাভিত্তিক বা আমলাতান্ত্রিক। প্রতিটি সরকারী সংগঠন বা দপ্তরই আমলাতন্ত্রের অংশ; সেটা প্রকৌশলীদের, কৃষিবিদদের, চিকিৎসকদের, পুলিশ বাহিনীর বা তথ্য কর্মকর্তাদের কিংবা যাদেরই হোক না কেন। তাই সার্বিকভাবে সকল পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) সাভার, ঢাকা পরিচালিত অষ্টাদশ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের প্রায়োগিক অংশ হিসেবে "খ" শাখার প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারের মূল প্রবন্ধ হিসেবে ডিসেম্বর ২১, ১৯৯৬ তারিখে উপস্থাপিত। (পরিমার্জিত)।

গ্রন্থপঞ্জি

1. *Public Administration Efficiency study report*, Vol-1, Ministry of Establishment, Govt. of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka, Nov. 1989.
2. *The Public Administration Sector Study*, Bangladesh, UNDP, 1993.
3. *Asian Studies*, Dept. of Govt. and Politics, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka, May, 1985.
4. *Quest for Efficient Administration*, Md. Ali Akbar, Bangladesh Observer, August, 1993.
5. *Prime Minister, Parliament and Administrative* Reforms, M. Anisuzzaman, The Daily Star, July 22, 1996.